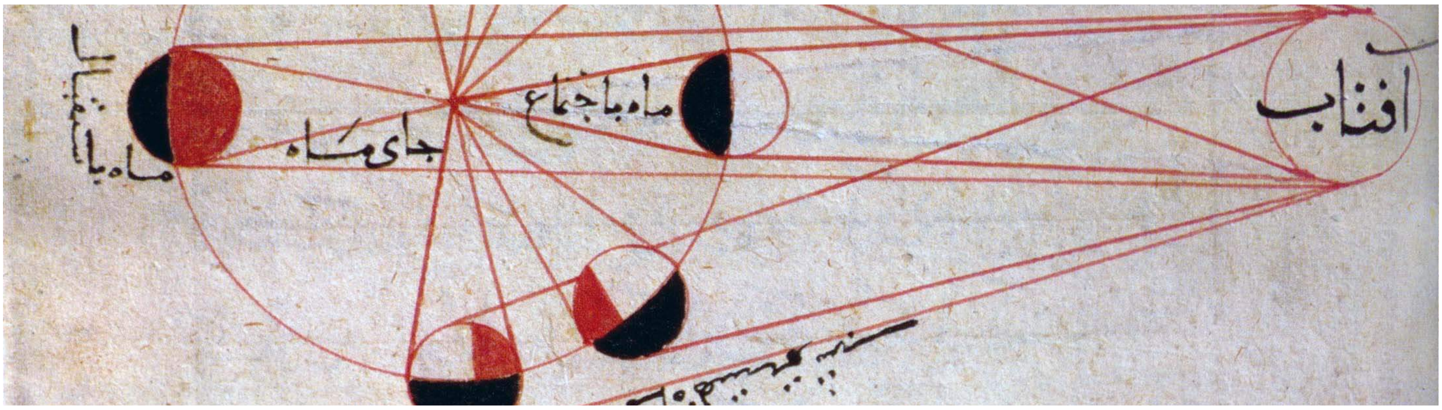

বিজ্ঞান এবং ধর্মঃ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সৈয়দ আলী আশরাফ

অষ্টম, নবম এবং দশম শতাব্দীতে গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত। বিজ্ঞান চর্চায়ও মুসলমানরা সর্বোন্নত জাতি। অথচ ধর্মের সংগে বিজ্ঞান-চর্চার কোন বিরোধ ঘটেনি। দ্বাদশ শতাব্দিতেও ইমাম গাজ্জালী [রহ:] বিজ্ঞান চর্চাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং এই জ্ঞানকে ধর্মবিরোধী বলেননি। তার কারণ, এই জ্ঞান এমন কোন থিওরীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি যা ধর্ম বিরোধী ছিল। বরঞ্চ কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই সৃষ্টিকে বিশেষভাবে জানার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ জমিন এবং আসমানের মধ্যে যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছুকে তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সেই নিয়মাবলি জানা- যার দ্বারা এই সৃষ্টি রক্ষিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। তাহলেই মানুষ এই সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে এবং এই সৃষ্টিকে নিজেদের মঙ্গলার্থে ব্যবহার করতে পারবে। তাই মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য ছিল এবং এখনও রয়েছে প্রাকৃতিক মূল নিয়মাবলি বোঝা এবং সে নিয়মকে ভেঙ্গে নতুন নিয়ম তৈরি করার ধৃষ্টতা না করা। বরঞ্চ উচিত হচ্ছে সেই নিয়মকে বুঝে তারই আওতায় নিজেদের মঙ্গলার্থে সৃষ্টিকে [প্রকৃতিকে] পূর্ণভাবে ব্যবহার করা।

> এই সৃষ্টিকে জানার জন্য একে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য আর একটি কারণও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সৃষ্টিকে যেন আমরা ভাল করে বুঝি তাহলেই আমরা তাঁর নৈকট্য লাভ করে আনন্দ পাব। আমরা বুঝব সৃষ্টি রহস্যের ভিতর আছে আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর সৌন্দর্য, আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য প্রোজ্জ্বল করার ক্ষমতা, আর এই সৃষ্টিকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা। আমরা আরো বুঝবো আল্লাহর সঙ্গে এবং আমাদের সংগে সৃষ্টির কি নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে। সত্যিকারভাবে আল্লাহ-সর্বগুণের অতীত এক অনন্য সত্তা। সৃষ্টির বৈচিত্র্য তিনি উদ্ভাবন করার জন্য নিজেও নিজের বিভিন্ন গুণ প্রকাশিত করলেন। সৃষ্টি করার ক্ষমতা, ধ্বংস করার ক্ষমতা, সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষমতা, কোমলতা, কঠোরতা ইত্যাদি অসংখ্য গুণের সমাহার প্রকাশিত হল। সেই সব গুণের ব্যবহার করেই অ-সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকে জীবন্ত করলেন। তাই প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি এ্যাটম, নিউট্রনও আল্লাহর প্রশংসায় নিয়োজিত। আল্লাহর এই গুণাবলীর বিচিত্র সমাবেশ বুঝতে হলে সৃষ্টির রহস্যও বুঝতে হবে।

সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার গুণাবলীর অপরিসীম সৌন্দর্য, মাহাত্ম এবং গৌরব আমরা বুঝব স্রষ্টাও তাই চান। সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধিও অর্জিত হয় যে, তিনি এই সমস্ত গুণের অতীত এক সত্তা। তিনিই একমাত্র উপাস্য, সৃষ্টি উপাস্য নয়। বরঞ্চ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে সেই জ্ঞান আল্লাহ দান করেছেন যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সৃষ্টির পূর্ণ রহস্য সে বুঝতে পারে। সত্য বুঝবার ক্ষমতা হলেই মানুষ সৃষ্টিকে তার ফেতরাত অর্থাৎ সৃষ্টির প্রকৃতি বা চরিত্র মোতাবেক তাকে ব্যবহার করে নিজস্ব মঙ্গল সাধন করতে পারে। সৃষ্টির রহস্য বুঝবার শক্তি এবং এ সম্বন্ধে জ্ঞান-ই হচ্ছে সেই আমানত যা আল্লাহ আদম [আ.] কে দিয়েছেন। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর "নাম" শিক্ষা দেয়া অর্থাৎ সেই সৃষ্ট বস্তুর সত্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা। কোন একটি বস্তুর "নাম"উচ্চারণ করার সাথে সাথে সেই বস্তুর সত্তা কি তা-ই আমাদের মনে উদিত হয়। আল্লাহ আদম [আ.] কে গোটা সৃষ্টির নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর সত্বা কি, আল্লাহর কোন্ কোন্ গুণ কোন্ বস্তুর সত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে আদম [আ.] সেই জ্ঞান আল্লাহর তরফ থেকে লাভ করলেন। এই জ্ঞানই সেই আমানত যার প্রাপ্তির ফলেই আদম [আ.] ফেরেশতাদের শিক্ষক হলেন।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তাই প্রকৃতি [nature] বা আসমান জমিন এবং এর মধ্যকার সমস্ত বস্তুই সৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং এ থেকে এক কথায় বলা হয় তাঁর সৃষ্টি। যেহেতু আল্লাহ তাঁর গুণের সাহায্যেই এই সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন, এই সৃষ্টিকে পূর্ণভাবে বুঝলেই আল্লাহর বিচিত্র, বিবিধ এবং অসংখ্য গুণাবলি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এবং আল্লাহর কুদরত, রহমত এবং বিবিধ ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। এই সৃষ্টিকে জানার এবং একে ব্যবহার করার দায়িত্ব আদম [আ.] গ্রহণ করেছিলেন আমানত হিসাবে- তাই সে দায়িত্ব নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী কম-বেশী প্রতিটি মানুষের। তাই আল্লাহর তৈরি নিয়মাবলিকে জেনে তারই আওতায় তার সুষ্ঠু ব্যবহার করার দায়িত্ব মানুষের, কিন্তু সেই নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার মানুষের নেই। বিজ্ঞান অর্থ এই সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। সেই জ্ঞান অর্জন করার দায়িত্ব প্রতিটি মানব গোষ্ঠীর, কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক স্থিরীকৃত প্রাকৃতিক নিয়মাবলি ভঙ্গ করার অধিকার মানুষের নাই। এই নিয়মকে পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম প্রচলন করারও অধিকার তার নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে পাশ্চাত্যে। তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা গ্রীক যুগে হয়েছিল। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। প্লেটোর মতে সত্যিকারের অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহর। বিশ্ব প্রকৃতির বা সারা সৃষ্টির অস্তিত্ব হচ্ছে আল্লাহর এরাদার বা ইচ্ছার উপর। তিনি ইচ্ছা করেছেন বলেই অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি অস্তিত্বে এসে উপনীত হয়েছে। বাহ্যত যদিও সৃষ্টির অস্তিত্ব আমরা আমাদের বাহ্যিক অস্তিত্বের মারফত উপলব্ধি করি, সত্যিকারভাবে এই সৃষ্টির কোন অস্তিত্ব নেই। একমাত্র আল্লাহর এরাদার ভিতরেই এর প্রকৃত অস্তিত্ব। প্রতিটি বস্তুর আদর্শরূপ সেই এরাদার মধ্যেই স্থিত। তাই বাহ্যিক সৃষ্টি জগতের মানুষ তার আত্মার অভ্যন্তরে সেই আদর্শ রূপ পাবে, বাহ্যিক জগতে দেখবে তার প্রতিচ্ছায়া। এ্যারিস্টটল যদিও প্লেটোর ছাত্র ছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেছেন যে, দুটি চিরন্তন আদিম সত্তা রয়েছে। আল্লাহ যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ-অনাদি এবং অন্তত এবং প্রকৃতি বা nature যা অনাদি এবং অনন্ত। আল্লাহ matter তৈরি করেননি। অর্থাৎ matter সৃষ্ট পদার্থ নয়।

খ্রিষ্টান চার্চ যখন প্রাধান্য পেল তখন তারা বিজ্ঞান চর্চাকে স্বীকৃতি দিল না। ইসলামী সভ্যতার উন্নতি এবং বিকাশকে খ্রিস্টান চার্চ স্বীকৃতি দেয়নি যদিও বিভিন্নভাবে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব ইউরোপীয় সভ্যাতার উপর পড়েছে এবং নানাভাবে ইসলামের প্রভাব এড়াবার জন্য ইসলামী জগতের সংগে ইউরোপীয়রা সম্পর্ক রক্ষা করতে চেষ্টা করেনি। তারই ফলে গ্যালিলিওকে ফাঁসী দেয়ার হুকুম গীর্জার তরফ থেকেই দেয়া হল। তাই বৈজ্ঞানিকরা এ্যারিস্টটলের দর্শনকে স্বীকৃতি দিল। তারা গীর্জাকে জানাল যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে কিছুই বলবে না, তারা শুধু matter [পদার্থ] সম্বন্ধেই গবেষণা করবে। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ম্যাটার নিয়েই গবেষণা করেছেন। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে তাদের কোন মন্তব্য নেই। ম্যাটারতার মতে কোন সৃষ্ট বস্তু নয়, সুতরাং এর উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন থিওরী উদ্ভাবিত হয়েছে। তার ফলে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির ধর্ম নির্ধারিত সম্পর্কে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা অগ্রাহ্য করেছেন এবং করছেন।

তারই ফলে আল্লাহর নির্ধারিত যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি [natural laws] রয়েছে তাকে ভেঙে চুরে নতুন নিয়ম তৈরি করার মত ধৃষ্টতা এবং ঔদ্ধত্য বৈজ্ঞানিকরা দেখাচ্ছেন। তার ফলে সৃষ্টিতে যে অনাসৃষ্টি জন্ম নিচ্ছে তার বহু প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকরা নিবৃত্ত হচ্ছেন না। ওজন লেয়ারে যে ঘটনা ঘটছে তা তারা জানেন অথচ কি করে এর হাত থেকে মুক্ত হবেন তা জানেন না। ত্রিশ দশকে আমেরিকাতে পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে চুরে নতুন নতুন শহর করতে যেয়ে একোলজি [Ecology] তে গড়বড় টের পেয়ে তারা বুঝতে পারলেন যে, পারিপার্শ্বিক স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করলে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তখনই পারিপার্শ্বিক বিজ্ঞান [Environment Science] এর জন্ম হয় এবং তখনি তারা বুঝতে পারলেন, প্রকৃতিতে যে নিয়ম রয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করে অথবা তাকে জবরদস্তি করে ভেঙে ফেলে নতুন কোন নিয়মে যদি কেউ প্রকৃতিকে পরিচালিত করতে চায় তাহলে সকলকেই অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই এখন থেকে পারিপার্শ্বিক বিজ্ঞানের উদ্ভুত হয় এবং ধর্ম যে নীতির কথা বলেছে প্রকৃতি সম্বন্ধে সেই নীতিকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিগত নীতিকে উল্টেপাল্টে দেয়ার মত ধৃষ্টতা না করাটাই যথার্থ নীতি বলে গ্রহণ করেছে।

তৎসত্ত্বেও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতিকে উল্টে দিয়ে নিজেই আর এক খোদা বলতে চায়। এই স্বাভাবিক প্রকৃতিগত নিয়মাবলি উল্টে দিলে কি ধরনের অস্বাভাবিকতা জন্ম নিবে তা বলা যায় না। ভেড়ার জীনের সংগে কুকুরের জীন মিলিয়ে দিয়ে যে বস্তুটির জন্ম হয়েছে তা অস্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবে- কুকুর ভেড়ার সংগে সহবাস কখনো করেনি এবং কখনো করবেও না। সুতরাং যা স্বাভাবিক [Natural] নয় সেই অস্বাভাবিকতা নীতি বিরুদ্ধ। তাই তা ধর্ম বিরুদ্ধ। ইসলাম এই ধৃষ্টতাকে সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টি জন্মানোর পাপ বলে গণ্য করে।

কুরআন শরীফে পাই শয়তান তার দূরদৃষ্টি দিয়ে আল্লাহর কাছে এই অভিযোগই করেছিল। সে বলেছিল : আল্লাহ তুমি যে আদমকে উচ্চ পদ দিয়েছ এক সময় এরই বংশধরেরা তোমার তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মাবলি ভেঙে নিজেদের তৈরি নিয়মাবলী ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ উত্তর করলেন : তাদেরকে তোমার সংগেই দোযখে নিক্ষেপ করব। শয়তানের ওকথা বলার অর্থ হচ্ছে

শয়তানই তাদেরকে প্ররোচিত করে এই ভুল পথে নেবে এবং এই দুর্বুদ্ধি দান করবে। যেহেতু পাশ্চাত্যের বহু বৈজ্ঞানিক এ্যারিস্টটলের কথায় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়েছেন এবং ধর্মভিত্তিক পথে এগিয়ে যাননি, সেহেতু তারা খোদার উপর খোদকারী করতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত নন।

> তা ছাড়া তারা প্রকৃতির আধ্যাত্মিকতার এবং নৈতিকতার কোন সম্পর্ক খুঁজে পান না। ইসলাম এই সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহর গুণাবলির যে প্রতিফলন দেখতে পায় এবং মানুষ এই সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার অর্থাৎ এই নৈতিকতার এবং গুণাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তারই সাহায্য নিয়ে নিজেদের মঙ্গল সাধনের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল যাকে আল্লাহ আমানতবলে আখ্যায়িত করেছেন- এই গূঢ়-গভীর তত্ত্বকে তারা জানেন না এবং জানতেও চান না। ফলে তারা যে কাজ করেছেন তাকেই আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব সত্তার উপর জুলুম করা বা অত্যাচার করা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা তা মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। বিবর্তনবাদকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে একটি বিবর্তিত জীবন বলেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই জীবের মধ্যে একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছে- বুদ্ধিশক্তি [reason] এই বুদ্ধিশক্তির মারফতেই সত্যকে মানুষ আবিষ্কার করেছে- একথা বিশ্বাস করেই বৈজ্ঞানিকরা এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি কিভাবে নিজ শক্তিকে ব্যবহার করবে যেহেতু তারা মানুষের আত্মিক সত্তাকেই অগ্রাহ্য করেছেন? সুতরাং মানুষের জ্ঞান আহরণ করার অস্ত্র হচ্ছে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যে খবর মস্তিষ্কে প্রেরণ করে বুদ্ধি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থিওরী তৈরি করে এবং সেই থিওরী কার্যকরী হলে তাকেই ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ধর্ম যে হৃদয়ের কথা বলে, যাকে আরবীতে ক্বালববলা হয়; যাকে বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না, কিন্তু যার সংগে বুদ্ধি [আকল] অনুভূতি, আত্মিক জ্ঞান এবং সত্তাগত উপলব্ধি এর নিগূঢ় সম্পর্ক যে ক্বালবের উপরেই কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল, যে ক্বালবের অবস্থার উপরই মানবচরিত্রের ভাল-মন্দ হওয়া নির্ভর করে সেই ক্বালবকে বিজ্ঞান অস্বীকার করে।

ইসলাম যে প্রমাণ দেয় তা বৈজ্ঞানিকেরা খণ্ডন করতে পারে না। প্রমাণ হচ্ছে যে, যে মুহূর্তে একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তির ক্বালববা হৃদয়ে আল্লাহর উপর বিশ্বাস উদ্রিক্ত হয়েছে সেই মুহূর্তে সেই ব্যক্তির অন্তরে সত্যবাদিতার প্রতি ভালবাসা জন্মগ্রহণ করেছে। সে ন্যায়পরায়ণ হতে চেয়েছে। সে অন্যায়ের হাত থেকে এবং অন্তর্নিহিত অন্যায় করা প্ররোচনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির মারফত ও অনুভূতি এবং উদ্যমের জন্ম হয়েছে। অন্তরে বা হৃদয়ে বিশ্বাসের জাগরণই তাকে জাগরিত করেছে। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসে ওমর [রা.] এর হৃদয়ে ঈমানের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং তার আমূল পরিবর্তন এবং সেই সংগে সংগে অন্যান্য অনেক ব্যক্তির পরিবর্তন ক্বালবের অস্তিত্বকে এবং তার বিরাট প্রভাবকে স্বীকার করে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে মানবতাকে ক্ষুদ্র করার প্রচেষ্টাকে কিভাবে আমরা গ্রহণ করব?

তাছাড়াও আমরা দেখি, যখন একটি দুবছরের শিশুও কথা বলতে এবং বুঝতে শিখেছে, সে সত্যবাদীকে বিশ্বাস করে, যাকে বোঝে এ মিথ্যাবাদী, তাকে বিশ্বাস করে না এবং পছন্দ করে না। এই সত্যপ্রীতি আল্লাহর তরফ থেকে তার আত্মায়, সুতরাং তার ক্বালবে প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে, এ বস্তু- দেহ নামধেয় পদার্থ সৃষ্টি করেনি। কারণ এ বস্তু পদার্থের অতীত একটি অন্তর্লীন [Innate] বস্তু।

মানবতা নির্ভর করে এই অন্তর্লীন মূল্যবোধের উপর। ধর্ম ও অন্তর্লীন মূল্যবোধকে বলিষ্ঠ করার জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিক ও জাগতিক অবস্থায় সেই মূল্যবোধকে কিভাবে কার্যকরী করতে হবে তার জন্য বিবিধ আইন-কানুনের ব্যবস্থা করেছে। দুনিয়ার প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে এই মূল্যবোধের এবং এর ব্যবহারিক প্রকাশের জন্য আইন কানুনের সামঞ্জস্য এমনকি একাত্মতা দেখতে পাই। মূসা [আ.] এর মাধ্যমে আল্লাহ দশটি মূলনীতি দিয়েছিলেন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেগুলি আমরা দেখতে পাই।

বিজ্ঞান স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মানুষকে এই নীতির বিরুদ্ধে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রত্যেকেরই যেন স্বাধীন এক মূল্যবোধ রয়েছে। অর্থাৎ মানবতার কোন চিরন্তন মানদণ্ড তারা মানছেন না। মানুষকে যে আল্লাহ তার আবেদ [দাস] করে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দাসত্বের মাধ্যমে আল্লাহর গুণাবলরি মধ্যে যে অসীম ক্ষমতা রয়েছে, সে ক্ষমতা ব্যবহারের অনুমতি মানুষ পায় এটা তারা বুঝতে চায় না। ফলে তারা মানুষের মনুষ্যত্বকে পরিপূর্ণতা অর্জন করার চাইতে তাকে গোলকধাঁরায় ফেলে বিপর্যস্ত করে তাকে স্বাধীনতার নামে স্বার্থপর এবং সংকীর্ণ এবং মানবিক বিভ্রান্তির [Confusion] মধ্যে ফেলে দেয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদির কুফলকে অগ্রাহ্য করার ফলে ধার্মিক যে কঠোর সাধনা করে এগুলোকে জয় করে মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্য অর্জন করে থাকে,

সেই মাহাত্ম্য থেকে আজকের বিজ্ঞানভিত্তিক মানুষ অনেক দূরে। সে কামনা বাসনার দাসে পরিণত হচ্ছে। তাই তাকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এমন ধরনের যৌন শিক্ষা [Sex Education] যা আমাদের সমাজকে বিশৃঙ্খল করে তুলছে।

ইসলামে বিজ্ঞান-চর্চার বাধা নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার ভিত্তিতে এমন দর্শন মেনে নিতে হবে যা মানবতার যে মহৎ আদর্শ ইসলাম দিচ্ছে তাকে আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করব এবং সমাজকে, দেশকে ও বিশ্বকে শূন্যতার মধ্যে দোদুল্যমান হতে দিব। ধর্মের মূলমন্ত্রকে মেনে নিয়ে যদি মানুষ অগ্রসর হয় তাহলে বিজ্ঞান-চর্চা মানুষকে সারা সৃষ্টিকে সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলির মাধ্যমে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। এজন্য বিজ্ঞানের মারফৎ মানুষ তখনই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয় যখন যে ব্যক্তি ঈমানের কাছে আশ্রয় নেয়, মানবিক আত্মাকে স্বীকার করে অগ্রসর হয়।

সূত্রঃ সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ (সৈয়দ আলী আশরাফ স্মরণ)

সৈয়দ আলী আশরাফ